মধুর আমার মায়ের হাসি

কবিতা পারভেজ

আমার মায়ের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ নভেম্বর। আমার নানা ছিলেন বগুড়ার এক কৃতি সন্তান। ১৯৩৯ সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (এফ আর জি এস) রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলোশীপ প্রাপ্ত বৃটিশ আমলের শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টার মরহুম শাহ আলী খান। আমার মা ছিলেন প্রথম কন্যা সন্তান তাই নানার বড় আদরের। খুব কম বয়সে মা স্কুলের পড়াশোনা, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা, তারপর রান্নাবান্না এ সবই এক হাতে সেরেছেন যেহেতু তখন নানীর শারীরিক অসুস্থতা একটা বড় সমস্যা ছিলো।

বগুড়ার ভি এম গার্লস্ স্কুল থেকে ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সাথে সাথেই মা'র বিয়ে হয়ে যায় ১২ই জুন। আমার বাবার বোহেমীয়ান জীবনে স্থিরতা আনবার জন্য দাদা তাঁর বড় দুই ছেলেকে রেখে সুন্দরী শিক্ষিতা এবং রান্নাবান্নায় নিপূনা এই লাজুক মেয়েটির সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ওদিকে নানার স্বপ্ন ছিলো আমার মা'কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি (পিএইচডি) পর্য্যন্ত পড়াবেন। মা তাঁর বাবার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন কিন্তু ততদিনে নানা ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন।

এর মধ্যে মা চার ছেলে মেয়েকে মানুষ করা, সংসারের হাল ধরে রাখার পাশাপাশি পড়াশোনাটাও সযতনে চালিয়ে গেছেন। ১৯৬৪ সনে প্রাইভেটে আই এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্ত্তি হলেন। ১৯৬৮ সনে অনার্স এবং উনসত্তরে মাস্টার্স শেষ করলেন। ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমিতে সহকারী সংস্কৃত অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে পনেরো বছর পর আবার ছাত্রী হলেন। ১৯৮৭-তে বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়ন নিয়ে ভারত সরকারের বৃত্তি অর্জন করে পিএইচডি করতে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর অসিত ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে গবেষণা করলেন "মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব" বিষয় নিয়ে। পিএইচডি শেষ করে আবার বাংলা একাডেমিতে। এর মধ্যে প্রমোশনও পেলেন সহকারী পরিচালক পদে। সত্যি কথা বলতে মায়ের এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে বরাবরই বাবার উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছিলো। এক সময়ে বাবার উৎসাহে মায়ের গবেষণার পেপার সমূহ জার্নালে প্রকাশিত হলো। আমার মা ড. মাহমুদা খানম রেবা ছিলেন বাঙালী ললনার মূর্ত প্রতীক। ছিলেন সুন্দরের পূজারী। প্রকৃতির বন্দনায় তাঁর আনন্দের সীমা ছিলো না। গুন গুন করে গান গাইতেন আর খোঁপায় ফুল গুঁজতেন। নয়তো ফুলের মালা। গাছপালা ফল-ফুল তাঁর প্রিয় বিষয়গুলির একটি।

প্রগতিশীল সংস্কৃতিবান মহিলা হিসেবে তাঁর পরিচিতি নেহায়েৎ কম ছিলো না। ষাটের দশকেও যখন মেয়েরা চার দেয়ালে প্রায় আবদ্ধ তখনো মা মঞ্চে, রেডিওতে অভিনয় করতেন। আবৃত্তি করতেন। সেতার বাজাতেন। লেখালেখির জগতেও বিচরণ করেছেন। এক সময়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকার মহিলাদের পাতা সম্পাদনা করতেন। প্রগতিশীল আন্দোলনে আমার মা অগ্রভাগে। ষাট দশকের শেষার্ধে আইয়ূব সরকার চোখ রাঙানী দিতে শুরু করলেন মেয়েরা লাল পাড় সাদা এবং হলুদ শাড়ী পরে কপালে টিপ দিতে পারবে না। আমার মা তখন জেদ করে প্রতিদিন অমন শাড়ী আর লাল টিপ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন।

সব সময় লক্ষ্য করতাম ভাষা সংস্কৃতির প্রতি মা'র অন্য রকমের দায়বদ্ধতা। একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনগুলোতে ভোর চারটার সময় ঘুম থেকে তুলে বাড়ীর সবাইকে নিয়ে যেতেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। প্রতি বছরই আবার মনে করিয়ে দিতেন একুশের সেই সংগ্রামী গাঁথা। কোন কোন সময় বাবা দেখাতেন তাঁরা সেই বায়ান্নোর একুশেতে কোথায় ছিলেন কি করেছিলেন। চুয়াত্তরে বাবা লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস কাউন্সিলর হয়ে যোগদান করলেন। আমরা স্বপরিবারে লন্ডনে। ভাইবোনরা সবাই স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। বয়স অল্প। মাঝে মাঝে ভাইবোনেরা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতাম। তাই শুনে আমার মায়ের মাথা গরম। বাবাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাদের দু'বোনকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা (যদিও অমূলক) আমরা সব বাংলা ভুলে ইংরেজ হয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক আমার বাবা এম আর আখতার মুকুলের স্ত্রী হিসাবে অনেক আত্মত্যাগ করে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মা। বাবা যেমন মাকে তাঁর লেখাপড়া নিয়ে সব সময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন তেমনি বাবার লেখালেখি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে মা'ও প্রেরণা যোগাতেন।

একটা ঘটনার কথা মনে হলো। ১৯৭১-এর জুলাই মাসের দিকে আমার দাদা মরহুম সা'দত আলী আখন্দ পাক সেনাদের গুলিতে নিহত হলেন। বাবা সে খবরে ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন। রীতিমত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁর কষ্টটা হলো তাঁরই কারণে তাঁর বাবাকে জীবন দিতে হলো। দাদার অপরাধ তিনি চরমপত্রের এম আর আখতার মুকুলের বাবা। যাইহোক, বাবা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি আর চরমপত্র করবেন না। কয়েকদিন চরমপত্র বন্ধও ছিলো। তখন আমার মা-ই তাঁকে বুঝিয়েছেন। বলেছেন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষসহ মুক্তিযোদ্ধারা তোমার চরমপত্রের পথ চেয়ে আছে। ওটাই তো সবার অনূপ্রেরণা। তোমার দোহাই তুমি এটা বন্ধ কোর না। মা'র কথা রেখে ছিলেন। বাবা তাঁর শ্রোতাদেরকে কিছুই জানতে দিলেন না। বন্ধের পর আবার এভাবেই তাঁর চরমপত্র শুরু করলেন – দিনা কয়েক আছিলাম না বিচ্ছুগো কায়কারবার দেখতে গেছিলাম ...। হায়রে বাড়ি রে বাড়ি। ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া গুলান অক্করে .....।

মুক্তিযুদ্ধে সামান্য হলেও আমার মায়েরও কিছু অবদান ছিলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'মুক্তিযোদ্ধার মায়ের চিঠি' অনুষ্ঠানে মায়ের ভুমিকায় নিয়মিত অভিনয় করতেন আমার মা। আমার মায়ের লেখা ছড়া আমি নিজেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আবৃত্তি করেছি। আকাশবাণী কলকাতা থেকে 'জ্বালাময়ী রৌশনআরা' নামে একটা অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মা'র অফিসের বেতনের অর্ধেক টাকাও কখনো বাড়ীতে আসতো কিনা সন্দেহ ছিলো। সে টাকা কি হতো জানলাম তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর অফিসের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন তাদেঁর কারো সন্তানের পড়ার খরচ কারো সংসারের আংশিক খরচ চালাতেন আমার মা। যেহেতু তাঁর আয় কখনো আমার বাবার সংসারে লাগতো না তাই কেউ তার হিসাবও রাখতো না।

মা আমার সারা জীবন কেবল সংগ্রামই করেছেন। যখন তাঁর নাতি নাতনিদের নিয়ে খেলার সময় এলো ঠিক তখনই মাত্র ৫৩ বছর বয়সে আজকের এই দিনে অর্থাৎ ১৯ মে মার্চ ১৯৯২-তে পৃথিবীর মায়া - তাঁর যুদ্ধের সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন।

মা সেদিন যখন চলে যান হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে শিয়রে আমি বসেছিলাম। অভিমানী মা আমার পাঁচদিন হয়ে গেছে অচেতন অজ্ঞান পড়ে আছেন। আর জ্ঞান ফিরলো না। তবু মনে হলো ঠোঁটের কোনে যেন সেই মুচকি হাসিটা লেগে আছে। সারা জীবন যে হাসিটা দিয়ে সবার মন জয় করেছিলেন - সেই হাসিটা।

করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে আমার প্রার্থণা আমার মায়ের মতন আর যাঁরা মা হারিয়েছেন তিনি যেন সেই সব মায়েদের বেহশত নছিব করেন। আমার মাকেও।